ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্প

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রত্যূষকুমার রীত

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ নিবেদন ॥

সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হয়ে উঠেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে এ বাড়ির সদস্যরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও সেই সত্য ধরা পড়ে।

বলা বাহুল্য ঠাকুরবাড়ির কৃতী সন্তান রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটোগল্পের রাজাধিরাজ। বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী তিনি এবং এখনও পর্যন্ত তিনি অনতিক্রম্য। বাংলা ছোটোগল্পকে বিশ্বদরবারে উন্নীত করেছিলেন তিনিই।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও ঠাকুরবাড়ির আরও অনেক সদস্যই গল্প রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভো ঠাকুর প্রমুখ অনেকের নামই করতে হয়। ইতিপূর্বে আমি 'ঠাকুরবাড়ির অজানা গল্প'-র দুটি খণ্ড সম্পাদনা করেছি (২০০৯) যথাক্রমে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি এবং ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন থেকে। তাছাড়া ঠাকুরবাড়িকে ঘিরে বিগত তিন বৎসরে আরও কয়েকটি গ্রন্থের কাজ করেছি। যেমন— 'ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা', 'ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য' (প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর পুণ্য পত্রিকা নিয়ে), সুষমা দেবীর 'শ্রীনগরের পথে', শোভনাসুন্দরী দেবীর 'জয়পুরী কথা' ইত্যাদি নানা গ্রন্থ।

গ্রন্থগুলি করার সময় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দেখার সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্পরচনাও আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সেগুলি বর্তমান সংকলনে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল। গল্পগুলিতে দেখা যাবে, ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি মহিলা সদস্যরাও গল্পরচনায় যথেষ্ট অগ্রবর্তিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা সকলেই জানি, বঙ্গসাহিত্যে প্রথম ছোটোগল্প 'মধুমতী' রচনা করেছিলেন (১৮৬৫) বঙ্কিম-অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে মহিলারাও, বিশেষত ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা গল্পরচনাতেও বড় বেশি পিছিয়ে ছিলেন না।

এদেশে উনিশ শতকের প্রথমে মিশনারিরা স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করলেও এবং এদেশীয় কয়েকজন মনীষী স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে আগ্রহী হলেও উনিশ শতকের প্রথম ৫০ বছরে মহিলারচিত কোনো রচনার সন্ধান প্রায় মেলে না। 'সংবাদ প্রভাকর' (মে, ১৮৪৯) প্রথম এক বালিকার কবিতা মুদ্রিত হয়। তারপর ১৮৫২ থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' ও অন্যান্য পত্রিকায় কতিপয় মহিলার রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ পর্যন্ত মহিলা রচিত ৫টি গ্রন্থ ও ৪টি পত্রিকায় মোট ২০টি

রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও সেখানে কোনো ছোটোগল্পের জন্মলাভ ঘটেনি। পরবর্তী দশ বছরে মহিলারচিত ১৯টি গ্রন্থ ও সাতটি পত্রিকায় ১২৩টি রচনার সন্ধান মেলে। সেগুলি উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে এগুলির মধ্যে মহিলা রচিত একটি গল্পগ্রন্থ ছিল। মিস লেসলী মেরী ই প্রণীত গ্রন্থটি ছিল 'স্টোরি অব বসন্ত' (১৮৬৮)। এই দশকেই বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম উপন্যাসের প্রকাশ ঘটে (১৮৬৮), 'মনোত্তম' (হিন্দুকুলকামিনী প্রণীত)।

১৮৭০-১৮৭৯ এই দশ বৎসরেও কোনো গল্প বা গল্পগ্রন্থ বঙ্গমহিলা দ্বারা রচিত হতে দেখা যায়নি। কিন্তু পরবর্তী দশ বৎসরে বঙ্গমহিলা রচিত গল্প ও গল্পগ্রন্থের দেখা পাওয়া যায়। এই দশকে (১৮৮০-১৮৮৯) প্রকাশিত বঙ্গমহিলা রচিত ৮৯টি গ্রন্থের মধ্যে ছোটোগল্প গ্রন্থ ছিল চারটি এবং ৩১টি পত্রিকায় ৫২১টি রচনার মধ্যে ছোটোগল্প ছিল ৪৬টি। এই সময়কালে বাইরের মহিলাদের পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা হেমলতা দেবী।

এই সময়কালে ঠাকুরবাড়ির বধূ হেমলতা দেবী একাধিক শিক্ষামূলক বা উপদেশধর্মী গল্প লিখেছেন 'সখা' পত্রিকার পাতায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বা স্বর্ণকুমারী দেবীর পাশাপাশি। 'সখা' পত্রিকার প্রথম ভাগ ১২ সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৮৮৩) তিনি লেখেন 'কে বড়লোক' নামক গল্পটি (পৃ. ১৮৭-৮৮)। যদিও রচনার শেষে 'সখা'-সম্পাদক এটিকে প্রবন্ধের ভাগে ফেলেছেন, তবুও এটি একটি উপদেশমূলক গল্প, এ নিয়ে দ্বিমত থাকবে না। স্বাভাবিকভাবেই ড. সংঘমিত্রা চৌধুরী তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে এটিকে গল্পরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই বৎসরের গত সংখ্যার (নভেম্বর ১৮৮৩) পত্রিকায় তিনি লিখেছেন 'সর্বোত্তম ছাত্রী' নামক গল্প (পৃ. ১৭২-৭৩)। 'সখা' পত্রিকায় মে, ১৮৮৫ (বৈশাখ ১২৯২) সংখ্যায় তিনি লেখেন 'লীলার ভয়' (পৃ. ৬৮-৬৯) নামক একটি গল্প। 'সখা' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ সংখ্যাতে তিনি লেখেন 'সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন' (পৃ. ১৩২-১৩৫)—এই গল্পগুলিকে আমরা গ্রন্থমধ্যে নিয়েছি পত্রিকা থেকে।

উল্লেখ্য যে এই সময়কালে লিখিত গল্পগুলি হল কাহিনি বা আখ্যান। আধুনিক ছোটোগল্প, 'লিরিকে'র আবির্ভাব ঘটেনি তখনও। এসময় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মালতী' উপন্যাসরূপে বিজ্ঞাপিত হয়েও স্বতন্ত্র গল্প-পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮০ খ্রি., ১২৮৬)। ১৮৮১ খ্রি. (১২৮৭)-তে প্রকাশিত হয় এক অনুবাদ গল্প, 'বাজনার বাক্স' বা 'সুখময় বাটী' (অনুবাদিকা কামিনী শীল)। ১৮৮৪ খ্রি. (১২৯১) তে 'শিশুর চিত্তরঞ্জন গল্প' (মিস কেডি প্রণীত) প্রকাশিত হয়। একই বৎসরে প্রকাশিত হয় তারাকালী চ্যাটার্জী রচিত 'বনশোভনা' নামক যুদ্ধ ও ভালোবাসাকেন্দ্রিক প্রাচীন ধরনের গল্পটি (১৮৪ পৃষ্ঠার)। গল্পের নায়িকা ছিল 'বনশোভনা'।

জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর বালক পত্রিকা (১২৯২) তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। ১৮৯০-১৯০০, এই সময়ে প্রকাশিত বঙ্গমহিলা রচিত ১২৩ গ্রন্থের মধ্যে ২টি গল্পগ্রন্থ এবং ৫৭টি পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮৫৬টি রচনার মধ্যে ১০০টি গল্প ছিল। এই সময়কালেই স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নবকাহিনী' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৮৯২)। ভারতী ও বালকে গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন ছিল জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সংখ্যায় (১৮৯২)। উল্লেখ্য যে বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম আধুনিক ছোটোগল্প গ্রন্থ হল স্বর্ণকুমারী দেবীর এই 'নবকাহিনী' গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প ভিখারিনী হলেও তাঁর প্রথম সার্থক ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা' হিতবাদীতে প্রকাশিত (১২৯৮)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটোগল্প বইয়ের প্রকাশ ঘটে ১৮৯৩ খ্রি. (১৩০০)-তে 'ছোটগল্প'। হিতবাদীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮। দেখা যাবে, এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর একঝাঁক গল্প (তাঁর 'নবকাহিনী', ১৮৯২-র আগেই)। যেমন—

'মালতী' (ভারতী, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬)
'বীরেন্দ্র সিংহের রত্নলাভ' (সখা ১৮৮৩)
'কুমার ভীমসিংহ' (ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৫)
'ক্ষত্রিয়ের রমণী' (ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৩)
'ক্ষত্রিয় স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি' (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭)
'সন্ন্যাসিনী' (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮)

—সুতরাং এখানে স্পষ্ট যে তিনি, রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে থেকেই ছোটোগল্প সম্বন্ধে সচেতন। তাছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী ছোটোগল্প রচনা করেছেন দীর্ঘ চারটি দশক জুড়ে। উল্লেখ্য যে, 'বীরেন্দ্র সিংহের রত্নলাভ' গল্পটির লেখিকার নাম সূচিপত্র থেকে (স্বর্ণকুমারী দেবী) উদ্ধার করেছেন পশুপতি শাসমল মহাশয়। এই 'উপদেশমূলক' গল্পটির কথাও লিখেছেন সংঘমিত্রা চৌধুরী, তাঁর 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মহিলারচিত রচনার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে।

উল্লেখ্য যে ১৮৯০-১৯০০, এই কালপর্বেই 'কুন্তলীন পুরস্কার' চালু হয় ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে। এ কারণে হেমেন্দ্রমোহন বসু স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ সময় কুন্তলীন পুরস্কার মেয়েরাও পান বাংলা গল্প রচনা করে। মোট ১৩ জন মহিলা এ পুরস্কার পেয়েছেন। মানকুমারী বসু পেয়েছেন তিনবার। তাছাড়া সরলাবালা দাসী (সরকার)-র নাম উল্লেখ্য। এ সময় জনৈকা সৌদামিনী দেবীর 'মাতঙ্গিনী' গল্পগ্রন্থের (১৮৯৫?) বিরূপ সমালোচনা লেখা হয় বামাবোধিনী (অগ্রহায়ণ ১৩০২) পত্রিকায় (পৃ. ২৫৩)। বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য।

এই কালপর্বে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছেন গল্প, 'ভিখারিনী' (ভাদ্র ১২৯৮, ১৮৯১, পৃ. ২৩৭)। স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীতে লিখছেন 'লজ্জাবতী', 'গহনা' প্রভৃতি গল্প। ইন্দিরা দেবী 'সাধনা'য় লিখছেন 'কমলকুমারিকাশ্রম' (১৮৯২, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ. ৫০-৭৪) নামক অনুবাদ গল্প। হিরণ্ময়ী দেবী এইসময়ই লিখছেন 'চন্দ্রালোক' নামক অনুবাদ গল্প। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্প রচনার ধারা পরবর্তী সময় আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশ। প্রজ্ঞাসুন্দরী প্রথম গল্প রচনার ১৩ বৎসর বা ৩৩ বৎসর পরেও গল্প লিখেছেন 'পুণ্য' বা 'সারদা' পত্রিকায়।

পরের দশকে অর্থাৎ ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৭, ১৩১০, ১৩১১, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'পুণ্য' পত্রিকায় শোভনাসুন্দরী দেবীর গল্পগুলি এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করে। 'সাহিত্য' পত্রিকায়

(১৭ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, পৃ. ১২৮) এক সমালোচনায় লেখা হয়েছিল "শ্রীমতী শোভনাসুন্দরী দেবীর 'শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা' নামক জয়পুরী গল্পটি মন্দ নহে।"

স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি অজস্র গল্প রচনা করেছেন। পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'-তেই তাঁর সর্বাধিক গল্প দেখতে পাওয়া যায়। 'ভারতী' পত্রিকায় সরলা দেবীও লিখেছেন কয়েকটি গল্প। 'ঠাকুরবাড়ির অজানা গল্প' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের নিবেদনে জানিয়েছিলাম, 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলা দেবীর গল্পগুলি সংকলিত হয়ে এক গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক এখনও তা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে এখন আর তার প্রয়োজনও থাকল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলনে (দে'জ পাবলিশিং ও নারীবিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০) গল্প অধ্যায়ে ২১টি গল্প সংকলিত হলেও সেখানে স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্তত আরও কয়েকটি গল্প আসেনি। আমরা পত্রিকার পাতা থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর সেইসব গল্পকেও এখানে তুলে ধরলাম। উল্লেখ্য একটি গল্পকে নানা অণু গল্পের সমাহার বলে ধরা যায়। সে গল্পটি হল 'কুড়ানো'। পরিশিষ্টে পূর্বোক্ত সংকলনটিতে স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের তালিকাটি (২১টি গল্প) এবং 'ভারতী' পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের তালিকাটি ধরে দেওয়া হল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গল্পস্বল্প' (প্রকাশ ১৩০০) গ্রন্থটিতে কোনো গল্পই নেই। তাঁর 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থটিতে (প্রকাশক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস) সংকলিত গল্পগুলি হল—মালতী, জীবন-অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি এবং অমরগুচ্ছ। গ্রন্থটিতে প্রকাশকালের উল্লেখ পাওয়া যায়নি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত)। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় এ গ্রন্থ থেকে 'জীবন- অভিনয়' গল্পটি বর্তমান সংকলনে গৃহীত হল। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নবকাহিনী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থেরও (কলিকাতা, কান্তিক প্রেস, ১৯১৪) কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিল। এটিও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। ভারতীতে প্রকাশিত 'হাসি' গল্প থেকে 'ম্যাল্যাঙ্গুরি বিনিময়' গল্পটি পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ক্রম পরিলক্ষিত হয়। যদিও এগুলি পৃথক পৃথক নামে 'গল্প' হিসাবেই পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছে, সূচিপত্রে তবুও এগুলি সমস্ত মিলিয়ে উপন্যাসরূপ লাভ করেছিল। সে কারণে বর্তমান গ্রন্থে গল্পগুলি নেওয়া হল না। কেবলমাত্র পরিশিষ্টে 'ভারতী' পত্রিকায় স্বর্ণকুমারীর গল্প রচনার তালিকায় সেগুলিকে ধরে দেওয়া গেল।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বড়ো মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবী অল্প হলেও কয়েকটি গল্প রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা তিনটি গল্পই 'ভারতী' থেকে সংকলিত হল। 'ভারতী'তে তিনি 'চন্দ্রালোক' নামে মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে একই গল্পের অনুবাদ করেন 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'চন্দ্রালোকে' নামে (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ. ৪২৯-৪৩৫)। পাঠক তুলনা করতে পারবেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বোন সরলা দেবীর কয়েকটি গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল । 'সরলা দেবীর রচনা-সংকলন' গ্রন্থে (দে'জ, ২০১১) সরলা দেবীর পাঁচটি গল্প সংকলিত। সরলা দেবীর অন্য একটি অতিরিক্ত এখানে গ্রহণ করা

হল। সরলাদেবীর 'প্রেমিকসভা' গল্পটি একটু স্বতন্ত্র ভাবনার। তাঁর 'পারস্যপুলক' ও 'হিন্দোলা' রচনাদুটি মূলত ভ্রমণকথার লক্ষণযুক্ত হলেও নূতন ধরনের গল্পরূপে তা গ্রহণ করা হল।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ গল্পকার সত্যেন্দ্রনাথের ছেলের মতো তাঁর মেয়েও গল্পরচনায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন পারিবারিক আবহাওয়ার প্রভাবেই। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা সেই ইন্দিরা দেবীর দুটি গল্প 'সাধনা' পত্রিকায়, দুটি গল্প 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা থেকে বর্তমান গ্রন্থে সেই চারটি গল্পই গৃহীত হল। তাছাড়া 'পার্বণী' থেকেও নেওয়া হল তাঁর দুটি গল্প।

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী খাদ্যপাক প্রণালী নিয়ে কেবলমাত্র 'পুণ্য' পত্রিকাতে নয়, বিভিন্ন পত্রিকাতেই লিখেছেন; খাদ্যপাকচর্চা নিয়ে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নাতেই প্রজ্ঞাসুন্দরীর আসল প্রতিষ্ঠা হলেও তাঁকে গল্পরচনা করতেও দেখা যায়। অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁর তিনটি গল্প সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেই তিনটি গল্পকেই বর্তমান সংকলনে গ্রন্থিত করেছি। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী 'পুণ্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'জয়ন্তী' গল্প। 'সারদা' পত্রিকায় তাঁর 'তিন মিতা' গল্প এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর 'ভিখারিনি' [ভিখারিণী] গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পকার হিসেবে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর ক্ষুদ্রতম হলেও মূল্যায়ন হওয়া উচিত। তাঁর 'তিন মিতা' গল্পে প্রকৃতি-ভাবনার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে দেখা যায়।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর বোন শোভনাসুন্দরী দেবীও অনেক গল্প রচনা করেছিলেন। তিনি ইংরেজিতেও গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। সে গ্রন্থ লন্ডনের ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর বাংলা জয়পুরী গল্পগুলি কিছু পূর্বে 'জয়পুরী কথা' (প্রকাশক 'এবং মুশায়েরা', ১ বৈশাখ, ১৪১৬) সংকলিত করেছি, যেগুলি 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শোভনাসুন্দরীর তেমনই কয়েকটি গল্পকে এখানে গ্রহণ করা হল। উল্লেখ্য যে, শোভনাসুন্দরী যেমন স্বামীর কর্মসংস্থানের জন্য (তাঁর স্বামী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজস্থানের জয়পুর রাজ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক) জয়পুর-চর্চায় মেতে উঠেছিলেন, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও প্রায় একই কারণে আসাম-চর্চায় মেতে ওঠেন (তাঁর স্বামী ছিলেন অসমিয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া)। বর্তমান গ্রন্থে প্রজ্ঞাসুন্দরীর 'জয়ন্তী' গল্পে আসামচর্চাই প্রাধান্য পেয়েছে।

যাই হোক, শোভনাসুন্দরীর গল্পগুলিতে সর্বদাই নৈতিকতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পগুলিতে যুক্তি পরম্পরাও অতি সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। 'ডালিমকুমারী'র প্রথম গল্পটি আংশিক ছিন্ন অবস্থায় কোনোক্রমে উদ্ধার করা গেলেও গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়নি। পাঠক লক্ষ করবেন, প্রতিটি গল্পই অনবদ্য, মনোরম। প্রায় প্রতিটি গল্পেই রূপকথা-লোককথার আমেজ ছড়ানো আছে। 'গঙ্গাদেব' গল্পটিতেও পাঠক রোমাঞ্চিত হবেন। গল্পগুলি নিজেরাই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য আলাদা কোনো সম্পাদনা অংশের প্রয়োজন নেই।

সংজ্ঞা দেবীর দুটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'পুণ্য' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। সংজ্ঞাদেবীর সেই জাপানি গল্প দুটি যথাক্রমে 'মৎসুয়ামার আয়না' ও 'ইউরিশিমা'।

স্বর্ণকুমারী দেবীর পর ঠাকুরবাড়িতে মহিলা সদস্যদের মধ্যে যিনি বেশি গল্প লেখেন ও

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হলেন হেমলতা দেবী। অথচ তিনি তেমন আলোচিত নন। হেমলতা দেবীর স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের জীবন-ইতিহাসের অনেক কথা উঠে এসেছে। তত্ত্ববোধিনীতে অনেক প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন নাটক ও গল্প। 'জ্যোতিঃ' এবং 'অকল্পিতা' দুটি কবিতা গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর 'দুনিয়ার দেনা', 'দেহলি' নামে দুটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'দুপাতা' গ্রন্থেও দুটি গল্প আছে। 'শ্রীনিবাসের ভিটা' তাঁর লেখা একটি রূপক-নাটিকা। তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'মেয়েদের কথা'। 'মিবার গৌরব কথা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'দুপাতা' গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (৬০বি, মির্জাপুর স্ট্রিট) এবং মুদ্রক অবিনাশচন্দ্র সরকার (ক্লাসিক প্রেস, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট)। এই গ্রন্থে চিত্রসহ দুটি গল্প আছে। যথা—'মহর্ষি রুদ্র' (পৃ. ১-৫) এবং 'রাজার স্বপ্ন' (পৃ. ৬-১৯)। এ গ্রন্থে 'পৃথিবীর ডাক' নামে একটি নাটিকা (পৃ. ২৩-৩৩) আছে। এখানে গল্প দুটি গ্রহণ করা হল।

'দুনিয়ার দেনা' নামে তাঁর গল্প গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে (প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন জগদানন্দ রায়) প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটির উৎসর্গ কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্মৃতির উদ্দেশে। ১৪১ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে সাতটি গল্প আছে। যথাক্রমে, বোঝা-বওয়া (পৃ. ১), ফকিরের ফাঁক (পৃ. ১০), দশের দোসর (পৃ. ২৬), পথের মানুষ (পৃ.৩৫), কাপালিকের কপাল (পৃ.৫৪), সাঁঝের পাড়ি (পৃ. ৯১), দুনিয়ার দেনা (পৃ. ১২৪-১৪১)।

'দুনিয়ার দেনা' গ্রন্থটিতে প্রকাশকের নিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশক জগদানন্দ রায় অতি সংক্ষেপে হেমলতা দেবীর সাহিত্যচর্চার মূল্যায়ন করেছেন। আমরা এখানে হেমলতা দেবীর এই গ্রন্থের সব গল্পকেও গ্রহণ করলাম; তাছাড়া এখানে সখা পত্রিকায় প্রকাশিত হেমলতা দেবীর চারটি গল্পকেও গ্রহণ করা গেল। গ্রন্থে প্রকাশকের নিবেদনটি নিম্নরূপ—

"গ্রন্থকর্ত্রী বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিতা নহেন। এ পর্যন্ত তাঁহার যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের একটা বিশেষত্ব এই যে সেগুলির মধ্যে কোনটাই অহেতুক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ নয়। তাঁহার রচনামাত্রেই চিন্তা করিবার বিষয় থাকে। এই পুস্তকখানিতেও গ্রন্থকর্ত্রীর সেই বিশেষত্বটি অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার সরস গল্পগুলির হাসিকান্নার মধ্যে পাঠক অনেক চিন্তা করিবার বিষয় পাইবেন—অথচ সেগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নীতিমূলক গল্পের মত নয়। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক নাই বলিলেই চলে। পুস্তকের প্রচ্ছদখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরিকল্পিত।....

শান্তিনিকেতন — জগদানন্দ রায়

কার্তিক, ১৩১৭"

হেমলতা দেবীর 'দেহলি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় (২১০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা) থেকে (প্রকাশক, কিশোরীমোহন সাঁতরা)। প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৪৬। গ্রন্থটি ১৩৫ পৃষ্ঠার। মুদ্রক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন প্রেস)।

গ্রন্থটির প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান চিঠি আছে—

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ছোটগল্প পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানব চরিত্রের কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের ছোটবড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য।

ইতি ৮ চৈত্র, ১৩৪৫
আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'দেহলি' গ্রন্থটিতে ৬টি গল্প, যথাক্রমে 'চলাচল', 'দশমিকানবমিকা', 'চন্দ্রমণি', 'হাটতলা', 'সুদর্শনের সংসার' ও 'প্রসাদ'। বর্তমান সংকলনে সবগুলিই গৃহীত হল। বস্তুতপক্ষে 'দেহলি' বা 'দুনিয়ার দেনা' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আর প্রয়োজন থাকল না।

মাধুরীলতা দেবীর আটটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শন, ভারতী, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনটি গল্প ইংরাজী থেকে অনুবাদ, যথা—মামা-ভাগ্নী, দ্বীপনিবাস ও চোর (ডিকেন্সের Dr. Mari Gold গল্পের)। 'চামরুর গল্প'টি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে মাধুরীলতার একসারসাইজ বুকে। উল্লেখ্য যে চামরু ছিল শিলাইদহ কুঠিবাড়ির চাকর। এ গ্রন্থে মাধুরীলতার সমস্ত গল্পগুলিই গৃহীত হল।

রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার প্রথম বার্ষিকী 'পার্বণ' (১৯১৮)। এখানে ইন্দিরা দেবী লেখেন 'টিকিরাম রায়' গল্প এবং দ্বিতীয় ও শেষ 'পার্বণী' (১৯২০) তে তিনি লেখেন 'বুদ্ধিমান তাঁতি' গল্প। তাছাড়া তাঁর আরো চারটি গল্প 'সাধনা' ও 'ভারতী' পাতা থেকে তুলে ধরা হল। শ্রদ্ধেয় অশোকুমার রায় মহাশয়ের থেকেও পেয়েছি কতকগুলি গল্পের কপি।

বর্তমান সংকলনে ঠাকুরবাড়ির মোট ১৩ জন সদস্যার ৮৮টি গল্প ধরে দেওয়া গেল। গল্পগুলিতে নারী স্বাধীনতা, সামাজিক বিষয়, প্রকৃতিভাবনা ইত্যাদি নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে গল্পগুলির পরিচয়দান করা বাহুল্যমাত্র, কারণ মূল গল্পগুলিকেই আমরা বর্তমান গ্রন্থে তুলে ধরেছি। পাঠক রস-আস্বাদন করতে পারবেন। বিচার-বিশ্লেষণ পাঠকই করবেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কুড়ানো', সরলাদেবীর 'প্রেমিকসভা', 'পারস্যপুলক', 'হিন্দোলা', এবং ইন্দিরা দেবীর 'রেজকি'— এই পাঁচটি গল্পের কোনোটি, গল্প হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল, আবার কোনো কোনোটি পরবর্তী সময় বিভিন্ন সংকলনে গল্প হিসাবেই গৃহীত হয়েছে। সেকারণে কিছু বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই রচনাগুলি বর্তমান সংকলনে রাখা গেল।

গল্পগুলিতে অনেকক্ষেত্রে পত্রিকার বানানকে অনুসরণ করেছি। তবে দ্বিত্ববর্জন করার চেষ্টা করেছি। কিছু ক্ষেত্রে সাধু-চলিতের মিশ্রণকে অপরিবর্তিত রাখা হল। গল্পগুলিকে প্রথমত বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে এবং দ্বিতীয়ত কালানুক্রমে সাজানোর চেষ্টা করে গেল। পাঠক পরিশিষ্টে গল্পগুলির প্রথম প্রকাশস্থান ও প্রকাশকালের হিসাবটি পাবেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ জানা যায় নি, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ উল্লেখিত হয় নি।

এবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা। প্রথমেই প্রকাশক মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। তাছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী এবং উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া ঠাকুরবাড়ি নিয়ে এর আগে যাঁরা কাজ করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং অনেকক্ষেত্রেই ঋণস্বীকার করছি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের এক ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য গ্রহণ করতে হল।

নমস্কারান্তে—

আগস্ট, ২০১২ প্রত্যূষকুমার রীত

॥ সূচিপত্র ॥

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

আশ্চর্য পলায়ন ১৯

স্বর্ণকুমারী দেবী

মালতী ৩৩

বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ ৪৭

কুমার ভীমসিংহ ৫০

কুড়ানো ৫৬

ক্ষত্রিয় রমণী ৫৯

ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি ৬৫

সন্ন্যাসিনী ৬৮

কেন ৭৬

লজ্জাবতী ৮০

গহনা ৮৯

যমুনা ৯৫

পেনে প্রীতি ১০২

ছোটখাট মিউটিনি ১১৩

জীবন অভিনয় ১১৮

অমরগুচ্ছ ১২০

চাবিচুরি ১২৯

প্রকৃত প্রতিশোধ ১৩৭

পূজার তত্ত্ব ১৪২

ট্যালিসম্যান ১৪৬

বিজয়ার আশীর্বাদ ১৫৬

স্বপ্ন না কি ১৬৮

নব ডাকাতের ডায়েরি ১৭৯

কান্তিবাবুর খোসনাম ১৮৯

তিনটি দৃশ্য ১৯৭

হিরন্ময়ী দেবী

ঋণপরিশোধ ২০৭

নিলাম ২১০

চন্দ্রলোক ২১৪

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

ভিখারিনি ২২১

জয়ন্তী ২২৭

তিনমিতা ২৩২

সরলা দেবী

বকুলের গল্প ২৩৯

প্রেমিকসভা ২৪২

বাঁশি ২৪৫

পারস্যপুলক ২৫০

হিন্দোলা ২৫৭

ইন্দিরা দেবী

বুড়া ও বুড়ির কথা (জাপানের গল্প) ... ২৬৩

কমল-কুমারিকাশ্রম ২৬৯

রেজকি ২৮০

মাতৃহীনা ২৮৩

টিকিরাম রায় ২৯১

বুদ্ধিমান তাঁতি ২৯৬

হেমলতা দেবী

কে বড়োলোক? ৩০১

সর্বোত্তম ছাত্রী ৩০৩

লীলার ভয় ৩০৬

সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন ৩০৮

মহর্ষি রুদ্র ৩১০

রাজার স্বপ্ন ৩১২

দুনিয়ার দেনা
বোঝা-বওয়া ৩২১
ফকিরের ফাঁক ৩২৫
দশের দোসর ৩৩১
পথের মানুষ ৩৩৫
কাপালিকের কপাল ৩৪৩
সাঁঝের পাড়ি ৩৫৯
দুনিয়ার দেনা ৩৭৩
দেহলি
চলাচল ৩৮৩
দশমিকা নবমিকা ৪০২
চন্দ্রমণি ৪১১
হাটতলা ৪১৯
সুদর্শনের সংসার ৪২৫
প্রসাদ ৪৩২
শোভনাসুন্দরী দেবী
দিলীপ ও ভীমরাজ ৪৪৫
লক্ষ টাকার এক কথা ৪৫১
ফুলচাঁদ ৪৫৫
গঙ্গাদেব ৪৬০
আনাররাণী বা ডালিমকুমারী
প্রথম পল্লব ৪৬৭
দ্বিতীয় পল্লব ৪৭২
লুব্ধ বণিক তেজরাম ৪৭৮
শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা ৪৮১
মাধুরীলতা দেবী
সৎপাত্র ৪৮৭
মাতা-শত্রু ৪৯১
মামা-ভাগ্নী ৪৯৮
দ্বীপনিবাস ৫০৭
সুরো ৫১০
অনাদৃতা ৫১৭
চোর ৫২১
চামরুর গল্প ৫২৭
সংজ্ঞা দেবী
মৎসুয়ামার আয়না ৫৩১
ইউরিশিমা ৫৩৩
সুরূপা দেবী
মোরগের তীর্থযাত্রা ৫৩৭
লোভী বউ ৫৩৮
কপালের লেখা ৫৩৯
চাঁদমামার গল্প ৫৪২
কালো আর আলো ৫৪৪
আষাঢ়ে গল্প ৫৪৬
পাগল ৫৫০
মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়
নাক-কাটা জমিদার ৫৫৫
নন্দিনী দেবী
ইঁদুরের ভোজ ৫৬৩
পরিশিষ্ট ৫৬৫

আশ্চর্য পলায়ন

রাশিয়ার অবস্থা তখন অতি ভয়ানক। রাজা প্রজায় কেবলই বিবাদ চলিতেছে। রাজা ভাবেন প্রজার প্রার্থনা সকল অতি অসংগত, তাহারা যত পায় ততই চায়, কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তাহাদের আশা কিছুতেই মিটে না, রাজার রাজ্য একেবারে উলটাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে। প্রজারা ভাবেন, রাজা নিজের সুবিধার জন্য কেবলই প্রজাপীড়ন করিতেছেন, তাহাদের নায্য অধিকারসকল হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছেন। প্রজাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক মিলিয়া একটি দল বাঁধিয়াছেন, রাজার অত্যাচার নিবারণ আর প্রজার হীনাবস্থা দূর করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ইঁহারা দলভুক্ত কোনো ব্যক্তির বাড়িতে কিংবা কোনো নির্জন স্থানে অতি গোপনে, অতি সতর্কতার সহিত একত্রিত হইয়া কী কী কার্য করিতে হইবে, কী নিয়মে, কী উপায়ে কোন্ কার্য করিতে হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করেন। পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় তাহা সিদ্ধ করিবার ভার আবশ্যক মতে এক কিংবা অনেক লোকের উপর দেওয়া হয়। যাঁহাদের উপর যে কার্যসিদ্ধির ভার দেওয়া হয় তাঁহারা একেবারে যথার্থই 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে কার্যে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের প্রতিজ্ঞা পর্বতের মতো অটল, পর্বতের মতো স্থায়ী, ইঁহাদের উৎসাহ বজ্রাগ্নির মতো। কোনো শারীরিক কষ্ট, কোনো মানসিক কষ্ট, কোনো বাহিরের বাধা ইঁহাদের মনকে গম্য পথ হইতে ফিরাইতে পারে না। ইঁহারা অনেক দিন ধরিয়া অসহ্য কষ্টভোগ করিয়া, যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রাণপণে যে কার্যসিদ্ধির জন্যে চেষ্টা করেন, তাহা যদি অবশেষে বিফল হইয়া যায় তবুও ইঁহারা সে কার্যে বিরত হন না। আবার নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহে নতুন পন্থা অবলম্বন করিয়া আগেকার মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই কার্যে প্রবৃত্ত হন, আবার অনেক দিন ধরিয়া অসহ্য কষ্টভোগ করিয়া, যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই প্রকারে যত বারই ইঁহাদের চেষ্টা বিফল হউক না কেন, প্রাণ থাকিতে ইঁহারা কখনোই হতাশ হইয়া সে কার্যের বিমুখ হন না। কখনোই এরূপ ভাবেন না যে, আমি যদি মরিয়াই গেলাম তাহা হইলে এ কার্যসিদ্ধি হইল আর না হইল তাহাতে আমার কী আসে যায়, আমি তো আর তখন ইহার ফলভোগ করিতে আসিব না। ইঁহারা যখন একটি কর্তব্য স্থির করিয়া তাহা সাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, সেই দণ্ড হইতে সেই কর্তব্যই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র ধর্ম হয়। ইঁহারা সেই ধর্মপালনে প্রাণ বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এই দলের সকল মানুষ এক প্রাণ এক মন—ঠিক যেন একজন মানুষের মতো হইয়া কাজ করেন, কাজ করিতে করিতে এক ব্যক্তি যেমনই প্রাণত্যাগ করিলেন, অমনি আর এক ব্যক্তি যেন তাঁহারই প্রাণ পাইয়া তাঁহারই মতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারই মতো উৎসাহে তৎক্ষণাৎ সেই অসম্পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত হইলেন। সহস্র সহস্র পুলিশের কর্মচারী ও সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ ইঁহাদিগকে

ধরিবার জন্যে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জনকতক লোককে একত্রে কথা কহিতে দেখিলেই অমনি রাজকর্মচারীদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়ে, তখনই একেবারে তাঁহাদের ধরিয়া ফেলে। এই দলভুক্ত লোকেরা হয়তো কত বৎসর ধরিয়া দিনরাত অতি সতর্কতার সহিত অতি সন্তর্পণে অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যে কার্যটি সিদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন, যখন সিদ্ধিলাভের আর অতি অল্পই বাকি আছে দেখিয়া আগ্রহে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো একটা অতি তুচ্ছ ঘটনাক্রমে রাজকর্মচারীদের দৃষ্টি তাঁহাদের উপরে পড়িল, অমনি এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত জীবনের যত্ন পরিশ্রম ধ্বংস হইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে. রাজকর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল, তার পরে তাঁদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে, নয়তো প্রাণদণ্ড অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড—অর্থাৎ সাইবেরিয়ায় নির্বাসন—তাহাই হইবে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হওয়া যে কী ভয়ংকর ব্যাপার তাহা আমাদের মধ্যে কেহ মনেও আনিতে পারে না। সাইবেরিয়ায় শীত অসহ্য, তাপমান যন্ত্রের যে ডিগ্রিতে পারা নামিলে এমনি ঠান্ডা পড়ে যে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সাইবেরিয়ায় শীতে পারা সে ডিগ্রির চেয়ে আরও ৫০ ডিগ্রি নীচে নামিয়া যায়। সেখানে বৎসরের মধ্যে অনেক মাসই সমস্ত দিনের মধ্যে সূর্য কেবল দুই কী তিন ঘণ্টা প্রকাশ পায়, আর অনেক দিন একাদিক্রমে দিনরাত সমভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করা যাহাদের অভ্যাস নাই, কিংবা যাহারা ফাঁদ পাতিয়া বন্যজন্তু শিকার করিতে জানে না এই প্রকার লোক সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইলে শীতে ও ক্ষুধায় শীঘ্রই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইবার খুবই সম্ভাবনা। এইরূপ শোনা গিয়াছে যে, একজন নির্বাসিত ব্যক্তি সুদীর্ঘ শীতকাল বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে উঠিয়া খানিকটা পচা তেল খাইতেন, এ ব্যতীত আর কোনো খাবার জিনিস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দারুণ নির্বাসনদণ্ড যে উক্ত দলের লোকসংখ্যা কমাইতে পারিয়াছে এমন কোনো প্রমাণ দেখা যায় না, বরং দিন দিন দল আরও বাড়িতেছে।

অনেক নির্বাসিতই পলাইবার চেষ্টা করে। যদিও পলায়নের পথ বিষম সংকটপূর্ণ, কিন্তু সাইবেরিয়াবাসের নরকযন্ত্রণা অপেক্ষা তাহা অধিক ভয়ানক নহে। ডেবাগোরিও মোগ্রিয়েভিচ নামক একজন সম্ভ্রান্ত নির্বাসিত ব্যক্তি তাঁহার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও তথা হইতে পলায়নের যে বিবরণ নিজমুখে প্রকাশ করেন তাহা 'কনটেম্পোরারি রিভিউ' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'ধরা-পড়া'

"আমি তখন কিয়েফ নগরে বাস করিতাম, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় রিলিনস্কি স্ট্রিটে রিভিচেভিচের বাসায় বিদ্রোহী দলভুক্ত কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর, আমরা কয়েকজন আমাদের বন্ধু মাদাম বেবিচেভের বাড়িতে গেলাম। গৃহকর্ত্রী আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গল্প জমিয়া আসিল, দুই-এক ঘণ্টা কাল বেশ আমোদে কাটানো গেল।

আন্টন প্রথমে উঠিলেন, তিনি রাস্তা পর্যন্ত গিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে পিস্তল ছোঁড়ার মতো একটা শব্দে আমরা সকলে চমকিয়া উঠিলাম। আমরা যেন হতভম্ভ হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম, স্ট্রোগড দৌড়িয়া গিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিলেন, দরজায় কান পাতিয়া শুনিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সন্তোষজনক খবর লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, রাস্তায় কোনও অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না, কাছাকাছি কোনো

দোকানের দরজা সজোরে বন্ধ করাতে হয়তো ওইরূপ শব্দ হইয়াছিল। আমরা আবার শান্ত মনে গল্প আরম্ভ করিলাম, চা খাইতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট বাদে আবার আমাদের শান্তিভঙ্গ হইল, এবার এমন সব শব্দ আসিতে লাগিল যে তাহাতে ভুল হইবার আর কোনো সম্ভাবনা রহিল না। উঠানে ভারী ভারী পায়ের শব্দ, তাড়াতাড়ি কথাবার্তা, হুকুমের আওয়াজ, অস্ত্রের ঝনঝনিতে বেশ বোঝা গেল কী হইবে।

পুলিশের লোক আমাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম যে আমরা বল প্রকাশ করিলেও বিনা মারামারিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবে। আমাদের কাহারও নিকটে একটিও অস্ত্র ছিল না। মুহূর্তকাল কষ্টকর ভাবনায় কাটিল। তার পরে দরজা সজোরে খুলিয়া গেল। দেখিলাম পাশের ঘর সৈন্যে পূর্ণ আর তাহারা সঙ্গীন নীচু করিয়া আক্রমণে প্রস্তুত। ডান দিক হইতে উচ্চ ও পরিষ্কার স্বরে হুকুম আসিল "মহাশয়গণ, ছাড়িয়া দিবেন কি? আমি এই সৈন্যদলের সেনাপতি।"

আমি ফিরিয়া দেখিলাম। দেখি যে সেনাপতি আর কেহ নয় স্বয়ং সুডেইকিন— পুলিশের সাজ ও খোলা তরবারিতে সজ্জিত।

আতঙ্কজনক সৈন্যসজ্জা, সেনাপতির গরম মেজাজ, সৈন্যদের কড়া চাউনি, আর ঝিকঝিকে সঙ্গীন, এ সব সত্ত্বেও আমার কেমন একটু মজা মনে হইতে লাগিল, আমি হাসি রাখিতে না পারিয়া সেনাপতিকে বলিলাম "আমরা কী একটা কেল্লা দখল করিয়া রাখিয়াছি যে আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ছাড়িয়া দিবেন কি?"

"তা নয়, কিন্তু তোমাদের সঙ্গীদের...."। নানা প্রকার শব্দে তাঁর কথার শেষ পর্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্ সঙ্গীদের?"

সুডেইকিন বলিবেন, "শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।"

তার পরে আমাদের সব খুঁজিয়া দেখিতে সৈন্যদের আজ্ঞা দিলেন, খোঁজা হইলে পুলিশে লইয়া যাইবেন।

খোঁজা শেষ হইল, আমরা ত্রিশ-চল্লিশ জন অস্ত্রধারী সৈনিকপুরুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া লাইবেড থানায় চলিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কোনো একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছে। থানা একেবারে আলোকময়, দরজার বাহিরে একদঙ্গল লোক জড়ো হইয়াছে, সবাই খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনের ঘরে নীত হইলাম। সে ঘর অস্ত্রধারী পুরুষে পূর্ণ। আমি কষ্টেসৃষ্টে ভিড় ঠেলিয়া দেখিলাম ঘরের অপর দিকে আমার কতকজন বন্ধু রহিয়াছেন। এ কী সর্বনাশ! তাঁদের এ কী দশা হইয়াছে! পোসেন আর স্টেব্লিন কামেনস্কির হাত-পা একেবারে বাঁধা; দড়ি এমনি টানিয়া বাঁধিয়াছে যে, দুই হাত একেবারে পিঠের উপরে গিয়া কনুইয়ে কনুইয়ে ঠেকাঠেকি হইয়াছে। তাঁদের কাছেই মাদাম আর্নফেল্ড সারানডোভিচ আর পাটালিজিনা। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আমরা কোর্সাডোভস্কির বাড়ি হইতে চলিয়া যাইবার পর সেখানে কোনো একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কেননা, তাহা হইলেই প্রমাণ হইবে যে আমরা পরিচিত। এখান-ওখান থেকে যে এক-আধটা কথা বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তাহা থেকেই জানিতে পারিলাম কী হইয়াছে। তাঁহারা পুলিশকে বাধা দিয়াছিলেন, একজন পুলিশের লোক মারা পড়িয়াছে, সেখানে যে কয়জন উপস্থিত ছিলেন সকলেই ধরা পড়িয়াছেন। এই সব শুনিতেছি এমন সময় একটা গোলমাল শোনা গেল—পায়ের শব্দ, চেঁচামেচি, ঝগড়ার মতো গলা, আমার মনে হইল যেন তার মধ্যে একটা গলার স্বর আমি চিনি। তখনই একজন লোক

দুজন পুলিশের লোককে একেবারে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ছুটিয়া সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, পুলিশের লোকেরা তাহাকে আটকাইবার জন্যে বৃথা চেষ্টা পাইতেছে। তাহার এলোথেলো চুল, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, আরক্ত চক্ষুতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে সে ব্যক্তি তাহার বলের অতীত যুঝাযুঝি করিতেছিল।

মিনিট কতকের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বলপূর্বক আমাদের নিকট বসাইয়া দিল।

কর্নেল নোভিটজকি আজ্ঞা দিলেন "বন্দিদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক করো।"

তৎক্ষণাৎ আমরা প্রত্যেকে চারিজন সৈনিক দ্বারা বেষ্টিত হইলাম।

কর্নেল আজ্ঞা দিলেন "উহারা যদি বাধা দেয়, তোমাদের সঙ্গীন চালাও।" কিছুক্ষণ পরে আমাদের একজনের পর আর একজনকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার ডাক পড়িলে আমি গিয়া দেখিলাম সেখানে অনেকগুলি পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত, তাঁরা আবার আমার সব খুঁজিয়া দেখিলেন।

খোঁজা হইয়া গেলে কর্নেল নোভিটজকি বলিলেন, "অনুগ্রহপূর্বক আপনার নাম বলুন।"

আমি উত্তর দিলাম "না বলিতে হইলেই ভালো হয়।"

কর্নেল বলিলেন "তবে আমিই তোমাকে বলিয়া দিব—তুমি কে!"

আমি উত্তর দিলাম, "তাহাতে আমি বড়োই সন্তুষ্ট হইব।"

কর্নেল বলিলেন—"তোমাকে লোকে ডেবাগোরিও মোগ্রিয়েভিচ বলিয়া ডাকে।"

আমি বলিলাম—"কর্নেল, আপনার সহিত আলাপ হওয়াতে আনন্দিত হইলাম।"

আমার নাম ভাঁড়াইতে চেষ্টা করা বৃথা। আমার মা, ভাই, ভগিনী সকলেই কিয়েফে ছিলেন, আমার পরিচয় পাইবার জন্যে যে তাঁদের সুদ্ধ থানায় টানিয়া আনিবে তাহা আদপেই আমার ইচ্ছা ছিল না।

কিয়েফের প্রধান কারাগারে আমাদের রাখিয়া দিল। আমাদের দোষের এক-একখানি তালিকা আমাদিগকে দিল—বিদ্রোহিতা, গুপ্ত নৈতিক সভার সভ্যশ্রেণিভুক্ত হওয়া, পুলিশকে বাধা দেওয়া—এই সমস্ত দোষে আমরা দোষী। আমরা সর্বসমেত চোদ্দো জন বন্দি, আটজন পুরুষ, ছয়জন স্ত্রীলোক। চারিদিন ধরিয়া আমাদের বিচার চলিতে লাগিল। সে বিচার, বিচার নামেরই যোগ্য নহে। তিনজনের ফাঁসির এবং অবশিষ্ট লোকের কারাবাসের আজ্ঞা হইল। আমরা কে কী শাস্তি পাইব তাহা জানিবার পর হইতে আমাদের কষ্ট কিছু কমিল। আগে আমাদের প্রত্যেককে একেবারে একেলা থাকিতে হইত এখন জেলের বাগানে একত্রে বেড়াইবার অনুমতি পাইলাম। একত্রে বেড়াইবার সুখ আমরা সমস্ত প্রাণের সহিত উপভোগ করিতাম আর তাহাতে আমরা কত যে সান্ত্বনা পাইতাম তাহা বলা যায় না। দণ্ডাজ্ঞার দুই সপ্তাহ পরে একদিন কারারক্ষকদিগের ভাবভঙ্গি ও অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, যাঁহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে কালই তাঁহাদের ফাঁসি হইবে। যাঁহারা ফাঁসি যাইবেন তাঁহারাও তাহা বুঝিতে পারিলেন। যদিও আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম যাহাতে আমাদের মুখে শান্ত ভাব ছাড়া আর কিছু প্রকাশ না পায়—তবুও সেদিন সন্ধ্যাবেলাকার বিদায় বড় হৃদয়বিদারক হইল। অন্যান্য বারে ভোরের বেলা ফাঁসি দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এবার মহাসমারোহে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ফাঁসি হইল। তিনটি বন্দির সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য চলিল। আমাদের বন্ধুদের দেহ যখন ফাঁসিকাঠে ঝুলিল তখনই সৈনিকরা তাহাদের ব্যান্ডে উল্লাস প্রকাশক একটা সুর বাজাইয়া উঠিল, যেন কী এক মহাযুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে।

ফাঁসির পর হইতে সাইবেরিয়ায় যাত্রা পর্যন্ত বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নাই। আমাদের কাহার কোথায় যাইতে হইবে সেই সম্বন্ধে প্রতিদিন নূতন নূতন গুজব শুনিতে পাইতাম আর আমরাও তাহাই লইয়া আন্দোলন করিতাম। দুই সপ্তাহ পরে একদিন শুনিলাম যে, এখনই যাত্রা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। আমাদের মতো কয়জন উচ্চবংশজাত লোককে কেবলমাত্র বন্দির কাপড় পরাইয়া দিল, অন্যদের মস্তক মুণ্ডন, পায়ে বেড়ি পর্যন্ত হইল। যাহাদের কঠিন পরিশ্রমের সহিত নির্বাসন, তাহাদের কাপড়ে ওইরূপ দুইটা চিহ্ন। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতে হইবে তাহা কী জানিতে পাইব না?" জেনারেল গুবার্নে উত্তর দিলেন "পূর্ব সাইবেরিয়ায়।" তখনই বুঝিলাম আমার অদৃষ্টে কী আছে—চোদ্দো বৎসর কঠিন পরিশ্রম —হয়তো এমন এক প্রদেশে থাকিতে হইবে যেখানে রাত্রি প্রায় কখনোই পোহায় না, যেখানে মেরুদেশের ন্যায় তীব্র শীত।

ট্রেনে করিয়া নিজনি নভগরদ পর্যন্ত গিয়া তথা হইতে জলপথে গর্মে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া মনে হইতে লাগিল যে যথার্থই সাইবেরিয়ায় যাইতেছি। আমরা এক-একখানা ছোটো তিন-ঘোড়ার গাড়ি করিয়া যাইতে লাগিলাম, প্রত্যেক বন্দির সম্মুখে একজন ও পার্শ্বে একজন করিয়া সৈনিক পুরুষ। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অসীম আকাশ, পথের দুই পার্শ্বে সুদূর দিগন্তব্যাপী নিবিড় বন ও পর্বতশ্রেণি। যাহাদের দৃষ্টি কত মাস হয়তো কত বৎসর ধরিয়া কেবল কারাগারের চারি দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ ছিল—প্রকৃতির এই মহান, অসীম দৃশ্য দেখিয়া ও স্বর্গীয় মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া মনে যে কীরূপ ভাবের উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা যে স্বাধীনতার জন্যে লালায়িত, এখানে যেন সেই স্বাধীনতাই মূর্তিমতী হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক তাহাদিগকে ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন।

আমরা দিনরাত চলিতে লাগিলাম। একদিন দ্বিপ্রহর-রাত্রে ঘোড়া বদল হইল, তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমার রক্ষকেরা নিদ্রায় অভিভূত। তাহারা কিছুক্ষণ ধরিয়া ঢুলিতেছে আর এক-একবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। চিন্তায় আমার ঘুম নাই, কিন্তু আমার মনে একটা ফন্দি উদয় হইল, আমিও ঢুলিতে ও নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলাম। আমার কৌশল খাটিল। কিছুক্ষণ বাদে রক্ষকদের এমনই নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল যে তাহাতে মৃতও জাগিয়া উঠে। সম্মুখস্থিত রক্ষক দু-হাত ও দুই-পা দিয়া তাহার বন্দুক জড়াইয়া একবার সামনে একবার পিছনে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল আর মাঝে মাঝে হেঁড়ে গলায় অস্পষ্ট বকিতে লাগিল স্বপ্নরাজ্যের গভীর প্রদেশে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া চারিদিকে চাহিলাম। নির্মল আকাশে কোটি কোটি তারকা জ্বলজ্বল করিতেছে, তখন আমরা একটা নিবিড় বনমধ্য দিয়া চলিতেছে। একটি লাফ দিলেই ওই বনমধ্যে যাইতে পারি। আর, একবার ওই বনমধ্যে যাইয়া পড়িতে পারিলে আমাকে ধরা পলাতক বাঘকে ধরার মতো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, কেননা আমি অতি দ্রুত দৌড়িতে সক্ষম এবং স্বাধীনতার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু এই বন্দির সাজ লইয়া কয়দিনই বা আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব? রাশিয়ায় পৌঁছিতে গেলে রাজপথ দিয়া যাইতে হইবে। যে সৈনিকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবে সেই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। আবার আমার মাথায় টুপি নাই তাহাতেও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আমার কোনো অস্ত্র নাই সেইটি আরও খারাপ। বন্য পশুদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষণে সক্ষম হইব না এবং শিকারও মারিতে পারিব না; বনে বনে পলাইতে হইলে শিকার ব্যতীত আর কোনো খাদ্য পাইব না।